সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

# হজ্জের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

# হজ্জের গোড়ার কথা

আরবী ভাষায় 'হজ্জ' অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা'বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'হজ্জ'। কখন কিভাবে হজ্জের সূচনা হয়েছিল, সেই ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। গভীর মনোযোগের সাথে সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করলে হজ্জের কল্যাণকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা পাঠকের জন্য সহজ হবে।

কি মুসলমান, কি খৃস্টান—হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম কারো অজানা নয়। দুনিয়ায় তিন ভাগের দু' ভাগেরও বেশী লোক তাঁকে 'নেতা' বলে স্বীকার করে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এ তিনজন শ্রেষ্ঠ নবীই তাঁর বংশজাত, তাঁর প্রজ্জলিত আলোকবর্তিকা থেকে সমগ্র দুনিয়ায় সত্যের জ্যোতি বিস্তার করেছে। চার হাজার বছরেরও বেশীকাল পূর্বে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন সমগ্র দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসেছিল। পৃথিবীর একজন মানুষও তাঁর প্রকৃত মালিক ও প্রভুকে জানতো না এবং তাঁর সামনে বন্দেগী ও আনুগত্যের ভাবধারায় মস্তক অবনত করতো না। যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে জাতির লোকেরা যদিও তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি ছিল ; কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার দিক দিয়েও তারাই ছিল অগ্রনেতা। সৃষ্ট জীব কখনও মা'বুদ বা উপাস্য হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-ভাস্কর্যে চরম উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও এ সহজ কথাটি তারা বুঝতে পারতো না। তাই তারা আকাশের তারকা এবং (মাটি বা পাথর নির্মিত) মূর্তির পূজা করতো। জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভালো-মন্দ জানার জন্য 'ফাল' গ্রহণ, অজ্ঞাত কথা বলা, যাদু বিদ্যা প্রয়োগ এবং দোআ তাবীয ও ঝাড়-ফুঁকের খুবই প্রচলন ছিল। বর্তমানকালের হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের মতো তখনকার সমাজে ঠাকুর-পুরোহিতেরও একটি শ্রেণী ছিল। তারা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতো, অপর লোকের পক্ষ থেকে পূজা করে দিত, বিপদ-আপদে বা আনন্দে-খুশীতে তারা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতো এবং 'অজ্ঞাত' কথা বলে লোকদেরকে প্রতারিত করতো। সাধারণ লোকেরা এদেরকেই ভাগ্য নির্ধারক বলে মনে করতো। তারা এদেরই অংগুলি নির্দেশে ওঠা-বসা করতো এবং

চুপচাপ থেকে নিতান্ত অন্ধের ন্যায় তাদের মনের লালসা পূর্ণ করে যেতো। কারণ তারা মনে করতো যে, দেবতাদের ওপরে এসব পূজারীর কর্তৃত্ব রয়েছে। এরা খুশী হলে আমাদের প্রতি দেবতাদের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ পূজারী দলের সাথে তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের গোপন যোগাযোগ ছিল। জনসাধারণকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও পূজারীগণ পরস্পর সাহায্য করতো। একদিকে সরকার পূজারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অন্যদিকে পূজারীগণ জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিত যে, রাজা-বাদশাহরাও 'আল্লাহর' মধ্যে গণ্য ; তারা দেশ ও প্রজাদের একচ্ছত্র মালিক, তাদের মুখের কথাই আইন এবং প্রজাদের জান-মালের ওপর তাদের 'যা ইচ্ছা' করার অধিকার আছে। শুধু এতটুকুই নয়, রাজা-বাদশাহের সামনে (সিজদায় মাথা নত করা সহ) তাদের বন্দেগীর যাবতীয় অনুষ্ঠানই পালন করা হতো—যেন প্রজাদের মন-মগযের ওপর তাদের প্রভুত্বের ছাপ স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যায়।

এহেন পরিবেশের মধ্যে এবং এ জাতির কোনো এক বংশে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্ম। আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই বংশটাই ছিল পেশাদার ও বংশানুক্রমিক পূজারী। তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন আপন বংশের পণ্ডিত-পুরোহিত ব্রাহ্মণ। কাজেই একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা সম্ভব, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামও ঠিক তাই লাভ করলেন। সেই ধরনের কথা-বার্তা শৈশবকাল হতেই তাঁর কানে প্রবেশ করতো। তিনি তার ভাই-ভগ্নীদের মধ্যে পীর ও পীরজাদাদের মতো আড়ম্বর এবং বড়লোকী চাল-চলন দেখতে পেতেন। স্থানীয় মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই গদিতে বসলে তিনি অনায়াসেই 'জাতির নেতা' হয়ে বসতে পারতেন। তাঁর গোটা পরিবারের জন্য চারদিক থেকে যেসব ভেট-বেগাড় আর নযর-নিয়াজ এসে জড়ো হতো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্যও তা বর্তমান ছিল। দেশের লোক নিজেদের চিরকালীন অভ্যাস অনুসারে তাঁর সামনে এসে হাত জোড় করে বসার এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে মাথানত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেবতার সাথে সম্পর্ক পেতে অজ্ঞাত কথা বলার ভান করে তিনি সাধারণ কৃষক থেকে তদানীন্তন বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। এ অন্ধকারে যেখানে সত্য জ্ঞানসম্পন্ন সত্যের অনুসারী একজন মানুষ কোথাও ছিল না সেখানে একদিকে তাঁর পক্ষে সত্যের আলো লাভ করা যেমন সম্ভবপর ছিল না তেমনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উভয় দিক দিয়েই এ বিরাট স্বার্থের ওপর পদাঘাত করে নিছক সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া

বিপদের গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হওয়াও কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে 'স্বতন্ত্র মাটি' দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন চন্দ্র, সূর্য, তারকা নিতান্ত গোলামের মতই উদয়-অস্তের নিয়ম অনুসরণ করছে, মূর্তি তো মানুষের নিজের হাতে পাথর দিয়ে গড়া, দেশের বাদশাহ আমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ, এরা রব হতে পারে কেমন করে ? যেসব জিনিস নিজের ইচ্ছায় একটুও নড়তে পারে না, নিজের সাহায্য করার ক্ষমতাও যেসবের মধ্যে নেই, জীবন ও মৃত্যুর ওপর যাদের বিন্দুমাত্র হাত নেই, তাদের সামনে মানুষ কেন মাথা নত করবে ? মানুষ কেন তাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করবে ? প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা কেন করবে ? তাদের শক্তিকে কেন ভয় করবে ? এবং তাদের গোলামীই বা কেন করবে ? আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছুই আমরা দেখতে পাই, যেসব জিনিস সম্পর্কে কোনো না কোনো ভাবে আমরা ওয়াকিফহাল, তার মধ্যে একটি জিনিসও স্বাধীন নয়, নিরপেক্ষ নয়, অক্ষয়-চিরস্থায়ীও নয়। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থা যখন এরূপ তখন এরা মানুষের 'রব বা প্রভু' কিরূপে হতে পারে ? এদের কেউই যখন আমাকে সৃষ্টি করেনি, আমার জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির এখতিয়ার যখন এদের কারো হাতে নেই, আমার রিযক ও জীবিকার চাবিকাঠি যখন এদের কারো হাতে নয়, তখন এদের কাউকেও আমি 'রব' বলে স্বীকার করবো কেন ? এবং তার সামনে মাথা নত করে দাসত্ব ও উপাসনাই বা কেন করবো ? বস্তুত আমার 'রব' কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, সকলেই যার মুখাপেক্ষী এবং যার হাতে সকলেরই জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির উৎস নিহিত রয়েছে। এসব কথা ভেবে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে বরং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

إِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - الانعام : ٧٨

"তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৮

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ - الانعام : ٧٩

“আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্ত্বাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।”

এ বিপ্লবাত্মক ঘোষণার পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেংগে পড়লো। পিতা বললেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো, বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেব। সমগ্র জাতি বলে ওঠলো আমরা কেউ তোমাকে আশ্রয় দেব না। স্থানীয় সরকারও তার বিরুদ্ধে লেগে গেল, বাদশাহর সামনে মামলা দায়ের করা হলো, কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একাকী এবং নিঃসংগ হয়েও সত্যের জন্য সকলের সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। পিতাকে বিশেষ সম্মানের সাথে বললেন ঃ “আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি তা আদৌ জানেন না। কাজেই আমি আপনাদের কথা শুনবো না, তার পরিবর্তে আমার কথা আপনাদের সকলের শোনা উচিত।”

জাতির লোকদের হুমকির উত্তরে নিজ হাতে সবগুলো মূর্তি ভেংগে ফেলে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। বাদশাহর প্রকাশ্য দরবারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ “তুমি আমার ‘রব’ নও, আমার ‘রব’ তিনিই যাঁর মুষ্ঠিতে তোমার আমার সকলেরই জীবন ও মৃত্যু নিহিত রয়েছে এবং যাঁর নিয়মের কঠিন বাঁধনে চন্দ্র, সূর্য সবই বন্দী হয়ে আছে।” রাজ দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে জীবন্ত জ্বালিয়ে ভষ্ম করা হবে। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দিল ছিল পর্বত অপেক্ষা অধিকতর শক্ত—একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ছিল তাঁর ভরসা। তাই এ ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতেও তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রস্তুত হলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে কাফেরদের অগ্নিকুণ্ড হতে মুক্তি দিয়েছিলেন তখন তিনি জন্মভূমি, জাতি, আত্মীয়-বান্ধব সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাথে নিয়ে পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যাঁর জন্য ঘরে পৌরোহিত্যের গদি অপেক্ষা করছিলো, সেই গদিতে বসে যিনি গোটা জাতির পীর হয়ে যেতে পারতেন এবং সেই গদিকে যিনি বংশানুক্রমিকভাবে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিতে পারতেন, তিনি নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির জন্য নির্বাসন, সহায়-সম্বল হীনতার নিদারুণ দুঃখ-মসিবতকেই শ্রেয় মনে করে গ্রহণ করলেন। কারণ দুনিয়াবাসীকে অসংখ্য ‘মিথ্যা রবের’ দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে সুখের জীবন যাপন করা তিনি মাত্রই বরদাশত করতে পারলেন না। বরং তার পরিবর্তে তিনি একমাত্র প্রকৃত রবের দাসত্ব কবুল করে সমগ্র দুনিয়াকে সেই দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং এ ‘অপরাধে’ (?) তিনি কোথাও একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারলেন না।

জন্মভূমি থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আরব দেশসমূহে ঘুরতে-ফিরতে লাগলেন। এই ভ্রমণ ব্যাপদেশ তাঁর ওপর অসংখ্য বিপদ এসেছে, ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা তাঁর সাথে কিছু ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি রুযি-রোযগার করার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করেননি। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কিরূপে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যেতে পারে। এ খেয়াল ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত মানুষটিকে যখন তাঁর পিতা এবং নিজ জাতি মোটেই সহ্য করলো না, তখন তাঁকে আর কে বরদাশত করতে পারে ? কোন্ দেশের লোক তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা জানাবে ? সকল স্থানে সেই একই ধরনের মন্দিরের পুরোহিত আর খোদায়ীর দাবীদার রাজা-বাদশাহরাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং সর্বত্র একই ধরনের অজ্ঞ-মূর্খ জনসাধারণ বাস করতো, যারা এ 'মিথ্যা খোদাদের' গোলামীর জালে বন্দী হয়েছিল। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি করে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে, যিনি নিজের রব ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি অন্য লোকদেরও বলে বেড়াতেন যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ মালিক, মনিব ও প্রভু নেই, সকলের প্রভুত্ব ও খোদায়ীর আসন চূর্ণ করে কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দারূপে জীবনযাপন কর। ঠিক এ কারণেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বছরের পর বছর ধরে তিনি উদভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও কেনানের জনপদে, কখনও মিসরে এবং কখনও আরবের মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। এভাবেই তাঁর গোটা যৌবনকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কালো চুল সাদা হয়ে গেল।

জীবনের শেষ ভাগে নব্বই বছর বয়স পূর্ণ হতে যখন মাত্র চারটি বছর বাকী ছিল এবং সন্তান লাভের কোনো আশাই যখন ছিল না তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সন্তান দান করলেন। কিন্তু তখনও এ আল্লাহর বান্দা এতটুকু চিন্তিত হয়ে পড়েননি যে, নিজের জীবনটা তো আশ্রয়হীনভাবে কেটে গেছে, এখন অন্তত ছেলেপেলেদেরকে একটু রুজী-রোযগারের যোগ্য করে তুলি। না, এসব চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়নি। বরং এ বৃদ্ধ পিতার মনে একটি মাত্র চিন্তাই জেগেছিল, তা এই যে, যে কর্তব্য সাধনে তিনি নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কর্তব্য পালন করার এবং তাঁর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করার মতো লোকের বিশেষ অভাব রয়েছে। ঠিক এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন তাঁকে

সন্তান দান করলেন, তখন তিনি তাকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এ 'পূর্ণ মানুষ'টির জীবন একজন সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ জীবন ছিল। যৌবনের সূচনাতেই—বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই যখন তিনি তাঁর রবকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন ঃ أَسْلِمْ–ইসলাম গ্রহণ কর—স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, আমার দাসত্ব স্বীকার করো। তিনি তখন উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারাজাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম। সমগ্র জীবন ভরে একথা ও এ ওয়াদাকে এই সাচ্চা মানুষটি সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং তার যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন। পৌরহিত্যের গদিতে বসলে তিনি যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারতেন তা সবই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের বংশ-পরিবার, নিজের জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে আগুনের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, নিজের জীবনের এক একটি মুহূর্তকে রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব আনুগত্যের কাজে এবং তাঁর দ্বীন ইসলামের প্রচারে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সন্তান লাভ হলো তখন তাঁর জন্যও এ ধর্ম এবং এ কর্তব্যই নির্ধারিত করলেন। কিন্তু এসব কঠিন পরীক্ষার পর আর একটি শেষ ও কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফায়সালা হতে পারতো না। সেই কঠিন এবং কঠোর পরীক্ষাও সামনে এসে পড়লো। বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর যে সন্তান লাভ হয়েছিল, সেই একমাত্র সন্তানকেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কিনা, তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ লাভ করার সাথে সাথে যখন তিনি নিজের পুত্রকে নিজের হাতে যবেহ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছো। আল্লাহর কাছেও তাঁর এ কুরবানী কবুল হলো এবং তাকে বলে দেয়া হলো যে, এখন তোমাকে সারা দুনিয়ার ইমাম বা নেতা বানিয়ে দেয়া যেতে পারে—এখন তুমি সেই জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছো। কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

"এবং যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সেই পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলো তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম (অগ্রবর্তী নেতা) নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের প্রতিও কি এ হুকুম ? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪

এভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো এবং তাঁকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের 'নেতা' নিযুক্ত করা হলো। এখন এ আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁর কয়েকজন সহকর্মী একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তিন ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের 'দক্ষিণ হাত' স্বরূপ কাজ করেছেন। একজন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যিনি—আল্লাহ তাঁর জীবন চান জানতে পেরে অত্যন্ত খুশী ও আগ্রহের সাথে—যবেহ হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় হচ্ছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি 'সাদুম' (ট্রান্স জর্দান) এলাকায় বসালেন। এখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা ইতর—লম্পট জাতি বাস করতো। সেখানে একদিকে সেই জাতির নৈতিকতার সংস্কার সাধন এবং সেই সাথে দূরবর্তী এলাকাসমূহেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোই ছিল তাঁর কাজ। ইরান, ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ী দল এ এলাকা দিয়েই যাতায়াত করতো। কাজেই এখানে বসে উভয় দিকেই ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামকে তিনি কেনান বা ফিলিস্তিন এলাকায় রাখলেন। এটা সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থান, তদপুরি এটা সমুদ্রো-পকূলবর্তী এলাকা বলে এখান থেকেই অন্যান্য দেশ পর্যন্ত ইসলামের আওয়াজ পৌঁছানো সহজ ছিল। এ স্থান থেকেই হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যার নাম ছিল

ইসরাঈল এবং পৌত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মারফতে ইসলামী আন্দোলন মিসর পর্যন্ত পৌছেছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে হিজাযের মক্কা নগরীতে বসালেন এবং দীর্ঘকাল যাবত নিজেই তাঁর সাথে থেকে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। তারপর এখানেই পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কা'বা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন, নিজেই এটা গড়ে তোলার স্থান ঠিক করেছিলেন। খানায়ে কা'বা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটা দীন ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হলো 'হজ্জ'। এই ইবাদাত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কি করে হলো, কোন্ সব পূত ভাবধারা এবং দোআ প্রার্থনা সহকারে পিতা-পুত্রে মিলে এ ইমারত তৈরি করেছিলেন আর 'হজ্জ' কিভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط ـ ال عمران : ٩٦ـ٩٧

"মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা মক্কার ঘর তাতে সন্দেহ নেই। এটা অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। এতে আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বর্তমান রয়েছে, 'মাকামে ইবরাহীম' রয়েছে এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে সে-ই নিরাপদে থাকবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط

"আমরা মানুষের জন্য কিরূপে বিপদশূন্য ও শান্তিপূর্ণ হেরেম তৈরী করেছি তা কি তারা দেখতে পায়নি ? অথচ তার চারপাশে লোক লুণ্ঠিত ও ছিনতাই হয়ে যেতো।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৭

অর্থাৎ আরবের চারদিকে যখন লুঠ-তরাজ, মার-পিট এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তির সয়লাব বয়ে যেত তখনও এ হেরেমে সর্বদা শান্তি বিরাজ

করতো। এমন কি দুর্ধর্ষ মরু বেদুঈন যদি এর সীমার মধ্যে তার পিতৃহন্তাকে দেখতে পেত, তবুও এর মধ্যে বসে তাকে স্পর্শমাত্র করতে সাহস পেত না।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ
مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا
اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

"এবং স্মরণ কর, যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় স্থল বানিয়েছিলাম এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থানকে 'মুসাল্লা' (জায়নামায) বানাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী এবং নামাযীদের জন্য আমার ঘরকে পাক ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, হে পালনকর্তা ! আপনি এ শহরকে শান্তিপূর্ণ জনপদে পরিণত করুন এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের জন্য ফল-মূল দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে দিন।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫-১২৬

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ - البقرة : ١٢٧-١٢٩

"এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করছিল ঃ পরওয়ারদিগার ! আমাদের এ চেষ্টা কবুল কর, তুমি সবকিছু জান এবং সবকিছু শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদের দু'জনকেই মুসলিম—অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলী থেকে এমন একটি জাতি তৈরী কর যারা একান্তভাবে তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পন্থা বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার!

তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দেবে এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিজ্ঞ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৯

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিল ঃ হে আল্লাহ ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তিপূজার শির্ক থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীত চলবে—তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার ! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এ মহান ঘরের নিকট, এ ধূসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি—এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ ! তুমি লোকদের মনে এতদূর উৎসাহ দাও যেন তারা এদের দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। হয়ত এরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫-৩৭

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۙ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۝ - الحج : ٢٦-٢٨

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম—একথা বলে যে, এখানে কোনো প্রকার শিরক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও—তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দীন-দুনিয়ার কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ২৬-২৮

'হজ্জ' শুরু হওয়ার এটাই গোড়ার ইতিহাস। এটাকে ইসলামের পঞ্চম রোকন (স্তম্ভ) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, দুনিয়ায় যে নবী বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, মক্কা-ই ছিল তাঁর প্রধান কার্যালয় (Head Quarter) পবিত্র কা'বাই ছিল এর প্রধান কেন্দ্র—যেখান থেকে ইসলাম দুনিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হতো। আর দুনিয়ায় যারাই এক আল্লাহর বন্দেগী করতে চাবে এবং বাস্তব কর্মজীবনে তাঁর আনুগত্য করে চলবে, তাঁরা যে জাতি আর যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন, সকলেই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রতি বছর এসে সমবেত হবে, এজন্য 'হজ্জ' করার পন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া যাবে যে, চাকা যেমন নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে, মুসলমানদের জীবনও তেমনি আপন কেন্দ্রেরই চতুর্দিকে আবর্তিত হয়—এ গূঢ় রহস্যেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে হজ্জ।

# হজ্জের ইতিহাস

কিভাবে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে হজ্জ শুরু হয়েছিল সে কথা পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এখানে বসিয়েছিলেন, যেন তার পরে তিনি এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন, একথাও পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পর তার বংশধরগণ কতকাল দীন ইসলামের পথে চলেছে তা আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা যে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে গিয়েছিল এবং অন্যান্য 'জাহেল' জাতির ন্যায় সর্বপ্রকার গুমরাহী ও পাপ-প্রথার প্রচলন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে এককালে এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত ও প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই কা'বা ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা হলো। এমনকি, মূর্তি পূজা বন্ধ করার সাধনা ও আন্দোলনে যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছিল তাদের মূর্তি নির্মাণ করেও কা'বা ঘরে স্থাপন করা হয়েছিল। তাওহীদী ধর্মের অগ্রনেতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরবর্তী বংশধরগণ লাত, মানাত, হুবাল, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা, আসাফ, নায়েলা আরও অসংখ্য নামের মূর্তি প্রস্তুত করেছিল এবং সে সবের পূজা করছিল। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করতো। ভূত-প্রেত, ফেরেশতা এবং মৃত পূর্বপুরুষদের 'আত্মা'র পূজাও করতো। তাদের মূর্খতা এতদূর প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদের বংশের মূর্তি না পেলে পথ চলার সময় যে কোনো রঙীন পাথর দেখতে পেতো তারা তারই পূজা শুরু করতো। পাথর না পেলে পানি ও মাটির সংমিশ্রণে একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার ওপর ছাগ দুগ্ধ ছিটিয়ে দিলেই তাদের মতে সেই নিষ্প্রাণ পিণ্ডটি খোদা হয়ে যেত এবং এরই পূজা করতো। যে পৌরোহিত্য ও ঠাকুরবাদের বিরুদ্ধে তাদের 'পিতা' হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সমগ্র ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তা-ই আবার তাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল, কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার আড্ডাখানা বানিয়ে নিজেরাই সেখানকার পুরোহিত সেজেছিল। হজ্জকে তারা 'তীর্থযাত্রা'র অনুরূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর থেকে মূর্তিপূজার প্রচার শুরু করেছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকদের কাছ থেকে 'নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড়'

আদায় করতো। এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে গেল।

এ ঘোর জাহেলী যুগে হজ্জের যে চরম দুর্গতি হয়েছিল একটি ব্যাপার থেকে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। মক্কায় একটি বার্ষিক মেলা বসতো, আরবের বড় বড় বংশ ও গোত্রের কবি কিংবা 'কথক' নিজ নিজ গোত্রের খ্যাতি, বীরত্ব, শক্তি, সম্মান ও বদান্যতার প্রশংসায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলতো এবং পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার প্রকাশের ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতো। এমন কি অপরের নিন্দার পর্যায়ও এসে যেত। সৌজন্য ও বদান্যতার ব্যাপারেও পাল্লা দেয়া হতো। প্রত্যেক গোত্র-প্রধান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ডেগ চড়াতো এবং একে অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে উটের পর উট যবেহ করতো। এ অপচয় ও অপব্যয়ের মূলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল ; তা এই যে, এ সময় কোনো বদান্যতা করলে মেলায় আগত লোকদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং কোন্ গোত্রপতি কতটি উট যবেহ করেছিল এবং কত লোককে খাইয়েছিল ঘরে ঘরে তার চর্চা শুরু হবে। এসব সম্মেলনে নাচ-গান, মদ পান, ব্যভিচার এবং সকল প্রকার নির্লজ্জ কাজ-কর্মের অনুষ্ঠান বিশেষ জাঁক-জমকের সাথে সম্পন্ন হতো। এ উৎসবের সময় এক আল্লাহর দাসত্ব করার কথা কারো মনে জাগ্রত হতো কিনা সন্দেহ। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো। কিন্তু তার পদ্ধতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষ সকলেই উলংগ হয়ে একত্রে ঘুরতো আর বলতো আমরা আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় যাব, যেমন অবস্থায় আমাদের মা আমাদেরকে প্রসব করেছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে 'ইবাদাত' করা হতো, একথা ঠিক ; কিন্তু কিভাবে ? খুব জোরে হাততালি দেয়া হতো, বাঁশি বাজান হতো, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হতো। আল্লাহর নামও যে সেখানে নেয়া হতো না, এমন নয়। কিন্তু কিরূপে ? তারা বলতো ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِيْكُهُ وَمَا مَلَكَ

"আমি এসেছি, হে আমার আল্লাহ ! আমি এসেছি, তোমার কেউ শরীক নেই ; কিন্তু যে তোমার আপন, সে তোমার অংশীদার। তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানারও মালিক।"

আল্লাহর নামে সেখানে কুরবানীও দেয়া হতো। কিন্তু তার পন্থা ছিল কত নিকৃষ্ট ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কুরবানীর রক্ত কা'বা ঘরের দেয়ালে লেপে দিত এবং এর গোশত কা'বার দুয়ারে ফেলে রাখতো। কারণ, তাদের ধারণা মতে আল্লাহ এসব রক্ত ও গোশত তাদের কাছ থেকে কবুল করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময়ই হজ্জের চার মাসে রক্তপাত হারাম করে দেয়া হয়েছিল এবং এ সময় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তী-কালের লোকেরা এ নিষেধ অনেকটা মেনে চলেছে বটে ; কিন্তু যুদ্ধ করতে যখন ইচ্ছা হতো, তখন তারা এক বছরের নিষিদ্ধ মাসগুলোকে 'হালাল' গণ্য করতো এবং পরের বছর তার 'কাযা' আদায় করতো।

এছাড়া অন্যান্য যেসব লোক নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল তারাও নিতান্ত মূর্খতার কারণে আশ্চর্য রকমের বহু রীতিনীতির প্রচলন করেছিল। একদল লোক কোনো সম্বল না নিয়ে হজ্জে যাত্রা করতো এবং পথে পথে ভিক্ষা মেগে দিন অতিবাহিত করতো। তাদের মতে এটা খুবই পুণ্যের কাজ ছিল। মুখে তারা বলতো—"আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য যাচ্ছি—দুনিয়ার সম্বল নেয়ার প্রয়োজন কি ?" হজ্জে গমনকালে ব্যবসা করা কিংবা কামাই-রোযগারের জন্য শ্রম করাকে সাধারণত নাজায়েয বলেই ধারণা করা হতো। অনেক লোক আবার হজ্জের সময় পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিত এবং এরূপ করাকেও তারা ইবাদাত বলে মনে করতো। কোনো কোনো লোক হজ্জে যাত্রা করলে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিত। এর নাম ছিল 'হজ্জে মুছমিত' বা 'বোবা হজ্জ'। এভাবে আরও যে কত প্রকার ভ্রান্ত ও কুপ্রথার প্রচলন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না।

এরূপ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কম-বেশী দু' হাজার বছর পর্যন্ত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে আরব দেশে কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি, আর কোনো নবীর প্রকৃত শিক্ষাও সেই দেশে পৌঁছেনি। অবশেষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলো। তিনি কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! এ দেশে একজন নবী এ জাতির মধ্য থেকেই প্রেরণ কর, যে এসে তাদেরকে তোমার বাণী শুনাবে ; জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করবে।" এ দোয়া আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়েছিল, তাই তাঁরই অধস্তন পুরুষে একজন 'কামেল ইনসান' আবির্ভূত হলেন, যাঁর পাক নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেরূপ পূজারী ও পুরোহিতের বংশে জন্মলাভ করেছিলেন, এ 'কামেল ইনসান' হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—শতাব্দীকাল ধরে যারা কা'বা ঘরের পৌরোহিত্য করে আসছিল। একচ্ছত্রভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেরূপ আপন বংশের পৌরোহিত্যবাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন নিজ বংশীয় পৌরোহিত্য ও পণ্ডিতগিরির ওপর। শুধু তাই নয়, তাঁর আঘাতে তা একেবারে মূলোৎপাটিত হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন বাতিল মতবাদ ও সমগ্র মিথ্যা খোদায়ী ধ্বংস করা এবং এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করেছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রচারিত প্রকৃত ও নির্মল দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একুশ বছরের চেষ্টায় তার এসব কাজ যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে কা'বা ঘরকেই তিনি সমগ্র দুনিয়ায় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের কেন্দ্ররূপে স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন এবং দুনিয়ার সকল দিক থেকেই হজ্জ করার জন্য কা'বা ঘরে এসে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানালেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○- ال عمران : ٩٧

"মানুষের ওপর আল্লাহর হক এই যে, এ কা'বা ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ যাদের আছে তারা হজ্জ করার জন্য এখানে আসবে। যারা কুফরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে আসবে না), তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭

এভাবে নব পর্যায়ে হজ্জ প্রবর্তন করার সাথে সাথে জাহেলী যুগে দু' হাজার বছর যাবত প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার একেবারে বন্ধ করা হলো। কা'বা গৃহের মূর্তিগলো ভেংগে ফেলা হলো। আল্লাহ ছাড়া মূর্তির যে পূজা সেখানে হতো তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হলো। মেলা এবং সকল প্রকার তামাশা ও উৎসব নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। আল্লাহর ইবাদাত করার সঠিক এবং স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলন করা হলো, আল্লাহর আদেশ হলো ঃ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

"(আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদাত করার,) যে পন্থা আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তদনুযায়ী আল্লাহর স্মরণ (ও ইবাদাত) কর যদিও এর পূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে (অর্থাৎ স্মরণ ও ইবাদাত করার সঠিক পন্থা জানতে না)।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮

সকল অন্যায় ও বাজে কর্মতৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলো ঃ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ البقرة : ١٩٧

"হজ্জ উপলক্ষে কোনরূপ ব্যভিচার, অশ্লীলতা, আল্লাহদ্রোহিতা, ফাসেকী কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না।"

কাব্য আর কবিত্বের প্রতিযোগিতা, পূর্বপুরুষদের কাজ-কর্মের কথা নিয়ে গৌরব-অহংকার এবং পরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা বা গালাগাল দেয়া বন্ধ করা হলো ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

"হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যেভাবে বাপ-দাদার স্মরণ করতো ঠিক অনুরূপ কিংবা তদপেক্ষা বেশী করে তোমরা আল্লাহর স্মরণ কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০০

শুধু লোকদের দেখাবার জন্য বা খ্যাতি অর্জন করার যেসব বদান্যতা ও দানশীলতার গৌরব করা হতো তা সবই বন্ধ হলো এবং তদস্থলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলের পশু যবেহ করার রীতি প্রচলিত হলো। কারণ এর ফলে গরীব হাজীদেরও কুরবানীর গোশত খাওয়ার সুযোগ মিলত।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ الاعراف : ٣١

"খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না ; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩১

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط ـ الحج : ٣٦

"খালেছ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এবং তারই নামে এ জন্তুগুলোকে যবেহ কর। যবেহ করার পর যখন প্রাণ একেবারে বের হয়ে যাবে, তখন নিজেরাও তা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকেও খেতে দাও।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৬

কুরবানীর পশুর রক্ত খানায়ে কা'বার দেয়ালে মর্দন করা এবং গোশত নিক্ষেপ করার কুপ্রথা বন্ধ হলো। পরিষ্কার বলে দেয়া হলো ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

"এসব পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তোমাদের তাকওয়া এবং পরহেযগারীই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭

উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং বলা হলো ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ ـ الاعراف : ٣٢

"হে নবী ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্ তার বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস (অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ) মনোনীত করেছেন, তা কে হারাম করলো ?"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩২

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَايَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط ـ الاعراف : ٦٨

"হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্ কখনও নির্লজ্জতার হুকুম দেন না।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৬৮

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ الاعراف : ٣١

"হে আদম সন্তান ! সকল ইবাদাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ (পোশাক পরিধান) কর।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩১

হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া এবং নিষিদ্ধ মাসকে যুদ্ধের জন্য 'হালাল' মনে করাকে বিশেষ কড়াকড়ির সাথে বন্ধ করা হলো ঃ

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَاحَرَّمَ اللّٰهُ ط

"নাসী কুফরীকে অধিকতর বাড়িয়ে দেয় (কুফরীর সাথে স্পর্ধাকে যোগ করে)। কাফেরগণ এভাবে আরও অধিক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। এক বছর এক মাসকে হালাল মনে করে আবার দ্বিতীয় বছর তার বদলে আর একটি মাসকে হারাম বেঁধে নেয়—যেন আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু এরূপ কাজ করলে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকেই হালাল করা হয়।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৭

সম্বল না নিয়ে হজ্জযাত্রা করা নিষিদ্ধ হলো এবং পরিষ্কার বলে দেয়া হলো ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز - البقرة : ١٩٧

"হজ্জ গমনকালে সম্বল অবশ্যই নেবে। কারণ, (দুনিয়ার সফরের সম্বল না নেয়া আখেরাতের সম্বল নয়) আখেরাতের উত্তম সম্বল তো হচ্ছে তাকওয়া।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭

হজ্জের সময় ব্যবসা করা বা অন্য কোনো উপায়ে রুজি-রোযগার করা নিতান্ত অপরাধের কাজ, আর এসব না করাকেই বড় পুণ্যের কাজ মনে করা হতো। আল্লাহ্ তাআলা এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে নাযিল করলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط - البقرة : ١٩٨

"(হজ্জে গমনকালে) ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ কিছু কামাই রোযগার করলে তাতে কোন অপরাধ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮

'বোবা' হজ্জ এবং 'ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত' হজ্জ হতেও মানুষকে বিরত রাখা হলো। শুধু তাই নয়, এছাড়া জাহেলী যুগের আরও অসংখ্য কুসংস্কার নির্মূল করে দিয়ে তাকওয়া, আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা এবং অনাড়ম্বরতাকে মানবতার পূর্ণাংগ আদেশ বলে ঘোষণা করা হলো, হজ্জযাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদেরকে সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে নেয়, নফসের খাহেশ ও লালসা যেন ত্যাগ করে, হজ্জগমন পথে স্ত্রী-সহবাসও যেন না করে, গালাগাল, কুৎসা রটানো, অশ্লীল উক্তি প্রভৃতি জঘন্য আচরণ থেকে যেন দূরে সরে থাকে। কা'বায় পৌছার যত পথ আছে, প্রত্যেক পথেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই স্থান অতিক্রম করে কা'বার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এহরাম বেঁধে গরীবানা পোশাক পরিধান করে নেবে। এতে আমীর গরীব সকলেই সমান হবে, পৃথক পৃথক কওম, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে যাবে। এবং সকলেই এক বেশে—নিতান্ত দরিদ্রের বেশে এক আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হবে। এহরাম বাঁধার পর মানুষের রক্তপাত করা তো দূরের কথা, পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ। মানুষের মধ্য থেকে পশু স্বভাব দূর করে শান্তিপ্রিয়তার গুণ সৃষ্টি এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় মহীয়ান করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। হজ্জের চার মাসকালের মধ্যে যেন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, এজন্য এ চারটি মাসকে 'হারাম' করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে কা'বা গমনের সমস্ত পথ নিরাপদ হবে ; হজ্জ যাত্রীদের পথে কোনোরূপ বিপদের আশংকা থাকবে না। এরূপ

পবিত্র ভাবধারা সহকারে তারা 'হেরেম শরীফে' প্রবেশ করবে—কোনোরূপ রং-তামাশা, নাচ-গান এবং মেলা আর খেলা দেখার উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রতি পদে পদে আল্লাহর স্মরণ—আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে হয়। আর এখানে একটি মাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, 'হেরেম শরীফের' প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয় ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ـ

"তোমার ডাকেই হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি এসেছি, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। সকল তা'রীফ প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। সব নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক—কেউ তোমার শরীক নেই।"

এরূপ পূত-পবিত্র এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ হজ্জ সম্পর্কে বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

"যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা এবং ফাসেকী থেকে দূরে থাকে, সে সদ্যজাত শিশুর মতই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে।"

অতপর হজ্জের কল্যাণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করার পূর্বে হজ্জ কি রকমের ফরয, তা বলা আবশ্যক। আল্লাহ কালামে পাকে বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ـ ال عمران : ٩٧

"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার মতো সামর্থ যার আছে, হজ্জ করা তার ওপর আল্লাহর একটি অনিবার্য নির্দিষ্ট 'হক'। এতদসত্ত্বেও যে তা অমান্য করবে সে কাফের এবং আল্লাহ দুনিয়া জাহানের মুখাপেক্ষী নন।"

এ আয়াতেই হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে পরিষ্কার কুফরী বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার মধ্যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ مَّلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا ـ

"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে।"

مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ـ

"যার কোনো প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, কোনো যালেম বাদশাও যার পথ রোধ করেনি এবং যাকে কোনো রোগ অসমর্থ করে রাখেনি—এতদসত্ত্বেও সে যদি হজ্জ না করেই মরে যায়, তবে সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মরতে পারে।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করতে ইচ্ছা হয় ; কারণ তারা মুসলমান নয়, মুসলমান নয়।"

আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত ইরশাদ এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর খলিফার এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয়। তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়নি। বস্তুত যেসব মুসলমানের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ আছে, শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই। দুনিয়ার যে কোণেই বাস করুক না কেন এবং যার ওপর ছেলে-মেয়ে ও কারবার কিংবা চাকরি-বাকরির যত বড় দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান যদি হজ্জকে এড়াতে চায় এবং অসংখ্য ব্যস্ততার অজুহাতে বছরের পর বছর তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়—সময় থাকতে আদায় না করে, তবে তার ঈমান আছে কিনা সন্দেহ। আর যাদের সমগ্র জীবনও হজ্জ আদায় করার কর্তব্য পালনের কথা মনে জাগে না, দুনিয়ার দিকে দিকে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়—ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতকালে হেজাযের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে—কা'বা ঘর যেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ, তবুও হজ্জ আদায় করার খেয়ালও তাদের মনে জাগ্রত হয় না—তারা কিছুতেই মুসলমান নয় ; মুসলমান বলে দাবী করার কোনোই

অধিকার তাদের নেই, দাবী করলেও সেই দাবী হবে মিথ্যা। আর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা কুরআন শরীফের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহেল। এসব লোকের মনে যদি মুসলিম জাতির জন্য দরদ থাকে তবে থাকতে পারে ; কিন্তু তার কোনোই সার্থকতা নেই। কারণ তাদের হৃদয়-মনে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের প্রতি ঈমানের কোনো অস্তিত্ব নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

# হজ্জের বৈশিষ্ট্য

কুরআন শরীফের যেখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এর প্রথম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ - الحج : ২৮ —মানুষ এসে দেখুক যে, এ হজ্জব্রত উদযাপনে তাদের জন্য কি কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ হজ্জের সময় আগমন করে কা'বা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, তা তাদের জন্য বস্তুতই কল্যাণকর। কেননা, এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা মানুষ নিজ চোখে দেখেই অনুধাবন করতে পারে। একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি হজ্জ করার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারেননি যে, ইসলামী ইবাদাতসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম ; কিন্তু যখনই তিনি হজ্জ করে তার অন্তর্নিহিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠলেন, 'হজ্জ-ই সর্বোত্তম ইবাদাত'।

এখানে হজ্জের বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। দুনিয়ার মানুষ সাধারণত দু' প্রকারের ভ্রমণ করে থাকে। এক প্রকারের ভ্রমণ করা হয় রুযি-রোযগারের জন্য, আর এক প্রকারের ভ্রমণ হয় আনন্দ-স্ফূর্তি লাভ ও অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে। এ উভয় প্রকারের সফরেই মানুষের নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তিই তাকে ভ্রমণে বের হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের গরযেই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, নিজের কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যেই সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে চলে যায়। আর এ ধরনের সফরে সে টাকা-পয়সা যা কিছুই খরচ করে নিজের উদ্দেশ্য লাভের জন্যই করে থাকে। কাজেই এসব সফরে মানুষকে আসলে কিছুই কুরবানী বা আত্মত্যাগ করতে হয় না। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা উল্লেখিত সফর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিজের কোনো গরযে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করার জন্য করা হয় না ; বস্তুত এটা করা হয় খালেছভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মানসে। এজন্যই মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা ও আল্লাহর ভয় জাগ্রত না হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফরযকে ফরয বলে মনে না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ সফরে যাওয়ার জন্য কিছুতেই উদ্যোগী হতে পারে না। কাজেই যে ব্যক্তি একটি দীর্ঘকালের জন্য নিজের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং নিজের কারবারে ক্ষতি, অর্থ ব্যয় ও সফরের কষ্ট স্বীকার করে হজ্জের জন্য বের হবে, তার এভাবে বের হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর

ভয় ও ভালবাসা আছে। আল্লাহর ফরযকে সে ফরয বলে মনে করে এবং মানসিকভাবে সে এতদূর প্রস্তুত যে, বাস্তবিকই যদি কখনো আল্লাহর পথে বের হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সে অনায়াসেই গৃহ ত্যাগ করতে পারবে। কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, নিজের ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশ সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কুরবান করতে পারবে।

এ পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে যখন সে হজ্জের সফরে যাবার জন্য তৈরী হয় তখন তার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হয়ে যায়। তার অন্তরে বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেমের উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত সে সেই দিকের জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তার মনে তখন নেক ও পবিত্র ভাবধারা ছাড়া অন্য কিছুই জাগ্রত হতে পারে না।

সে পূর্বকৃত যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করে, সকলের কাছে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এ যাবত আদায় করেনি তা আদায় করে, কারণ ঋণের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া সে মোটেই পসন্দ করে না। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা থেকে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি মঙ্গলের দিকেই নিবদ্ধ হয়, সফরে বের হওয়ার পর সে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তার হৃদয়-মনে পুণ্য ও পূত ভাবধারার তরংগ খেলে ওঠে। তার কোনো কাজ যেন কারো মনে কোনোরূপ আঘাত না দেয়, আর যারই যতটুকু উপকার করা যায় সেই সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টাই সে করতে থাকে। অশ্লীল ও বাজে কথা-বার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ থেকে তার প্রকৃতি স্বভাবতই বিরত থাকে। কারণ সে আল্লাহর 'হারাম শরীফের' যাত্রী তাই অন্যায় কাজ করে এ পথে অগ্রসর হতে সে লজ্জিত না হয়ে পারে না। তার সফরটাই যে ইবাদাত, এ ইবাদাতের কাজে যুলুম, আর পাপ কাজের কি অবকাশ থাকতে পারে ? অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর থেকে এ সফর সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের মনকে এ সফর প্রতিনিয়ত পূত-পবিত্র করতে থাকে। সত্য বলতে গেলে এটা একটি বিরাট সংশোধনকারী কোর্স বিশেষ, প্রত্যেক হজ্জযাত্রী মুসলমানকেই এ অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়।

সফরের একটি অংশ সমাপ্ত করার পর এমন একটি স্থান সামনে আসে যেখানে পৌঁছে প্রত্যেক মক্কাযাত্রী মুসলমান 'এহরাম' বাঁধতে বাধ্য হয়। এটা না করে কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারে না। এই 'এহরাম' কি ? একটি সিলাই না করা লুংগী, একখানি চাদর এবং সিলাইবিহীন জুতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর অর্থ এই যে, এতকাল তুমি যাই থাক না কেন, কিন্তু এখন তোমাকে ফকিরের বেশেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। কেবল বাহ্যিক ফকীরই

নয়, প্রকৃতপক্ষে অন্তরেও ফকীর হতে চেষ্টা কর। রঙীন কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ সকল পোশাক খুলে রাখ, সাদাসিধে ও দরবেশ জনোচিত পোশাক পরিধান কর। মোজা পরবে না, পা উন্মুক্ত রাখ, কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, চুল কেট না, সকল প্রকার অলংকার ও জাঁকজমক পরিহার কর। স্বামী-স্ত্রী সংগম হতে দূরে থাক, যৌন উত্তেজক কোনো কাজ করো না, শিকার করো না। আর কোনো শিকারীকে শিকারের কাজে সাহায্য করো না। বাহ্যিক জীবনে যখন এরূপ বেশ ধারণ করবে তখন মনের ওপরও তার গভীর ছাপ মুদ্রিত হবে, ভিতর হতেও তোমার মন সত্যিকারভাবে 'ফকির' হবে। অহংকার ও গৌরব দূরীভূত হবে, গরীবানা ও শান্তি-প্রিয়তার ভাব ফুটে ওঠবে। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার ফলে তোমার আত্মা যতখানি কলংকিত হয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার পবিত্র ভাবধারা তোমার জীবনের ভিতর ও বাইর উভয় দিককেই মহীয়ান করে তুলবে।

'এহরাম' বাঁধার সাথে সাথে হাজীকে একটি বিশেষ দোয়া বার বার পড়তে হয়; প্রত্যেক নামাযের পর, পথের প্রত্যেক চড়াই-উৎরাইয়ের সময়, কাফেলার সাথে মিলিত হবার সময় এবং প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার সময়। দোআটি এই ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ -

বস্তুত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর আদেশে (হজ্জ করার জন্য) যে সার্বজনীন আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার জবাবেই এ দোয়া পাঠ করার নিয়ম হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ শত বছর আগে আল্লাহর এ আহ্বানকারী ডেকে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর বান্দাগণ ! আল্লাহর ঘরের দিকে আস, পৃথিবীর প্রতি কোণ থেকে ছুটে আস। পায়ে হেঁটে আস, কিংবা যানবাহনে চড়ে আস।" এর জবাব স্বরূপ আজ পর্যন্ত 'হারাম শরীফের' প্রতিটি মুসাফির উচ্চৈস্বরে বলে ওঠেছে ঃ "আমি এসেছি, হে আল্লাহ, আমি হাজির হয়েছি। কেউ তোমার শরীক নেই, আমি কেবল তোমারই আহ্বানক্রমে এসেছি, সব তারীফ প্রশংসা তোমারই দান, কোনো কিছুতেই তোমার কেউ শরীক নেই।"

এভাবে 'লাব্বায়েকের' প্রত্যেকটি ধ্বনির মারফত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আমল থেকে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে 'হাজী'র নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাড়ে চার

হাজার বছরের দূরত্ব মাঝখান হতে সরে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। মনে হয় যেন এদিক থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর তরফ থেকে ডাকছেন, আর ওদিক থেকে প্রত্যেক হাজীই তার জবাব দিচ্ছে—জবাব দিতে দিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যতই সামনে অগ্রসর হয় ততই তার মনে প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আধ্যাত্মিক ভাবের ঝর্ণাধারা অধিকতর বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই-উৎরাইয়ের সময় তার কানে আল্লাহর আহ্বান ধ্বনিত হয়, আর সে তার জবাব দিতে দিতে অগ্রসর হয়। কাফেলার পর কাফেলা আসে, আর প্রত্যেকেই প্রেমিক পাগলের ন্যায় এই পয়গাম শুনে বলে উঠে ঃ "আমি এসেছি, আমি হাজির হয়েছি।" প্রতিটি নূতন প্রভাত তার কাছে বন্ধুর পয়গাম বহন করে আনে, আর উষার ঝলকে চোখ খোলার সাথে সাথেই আমি এসেছি, 'হে আল্লাহ ! আমি হাজির হয়েছি', বলে আওয়াজ দিতে থাকে। মোটকথা বারবার দেয়া এ আওয়াজ এহরামের গরীবানা পোশাক, সফরের অবস্থা এবং প্রত্যেকটি মঞ্জিলে কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নৈকট্যের ভাব উন্মাদনায় এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, হাজী আল্লাহর অতল স্পর্শ গভীর প্রেমে আত্মমগ্ন হয়ে যায় এবং সেই এক বন্ধুর স্মরণ ভিন্ন তার জীবনের কোথাও অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

এ অবস্থার ভিতর দিয়ে হাজী মক্কায় উপনীত হয় এবং সেখানে পৌঁছেই সোজা আসল লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যায়। বন্ধুর আস্তানাকে চুম্বন করে। তারপর নিজের আকীদা-বিশ্বাস, ঈমান, মতবাদ, দ্বীন ও ধর্মের কেন্দ্রস্থলের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এবং যতবার প্রদক্ষিণ করে ততবারই আস্তানাকে চুম্বন করে।[১] প্রত্যেক বারের তাওয়াফ কা'বা ঘরের কালো পাথর[২] চুমু দিয়ে শুরু ও শেষ করা হয়। এরপর 'মাকামে ইবরাহীম' নামক স্থানে দু' রাকাআত নামায পড়তে হয়। এখান থেকে বের হয়ে 'সাফা' পর্বতে আরোহণ এবং এখান থেকে যখন কা'বা ঘরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে, তখন সে উচ্চৈস্বরে বলে ওঠে ঃ

১. পবিত্র কা'বা ঘরে সংস্থাপিত 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন করে এ ঘর চুম্বন করতে হয়। এ চুম্বনের বিরুদ্ধে অনেক নির্বোধ ব্যক্তি এরূপ অভিযোগ তোলেন যে, এটাও এক প্রকার মূর্তি পূজা। অথচ এটা বন্ধুর আস্তানা চুম্বন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। পবিত্র কা'বা গৃহের তাওয়াফ করার সময়ের প্রতি তাওয়াফের শেষে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা হয় অথবা অন্তত পক্ষে তার প্রতি ইংগিত করা হয়। এতে এ কালো পাথরের পূজার সাথে তিলমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। এ প্রসংগে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বহুল প্রচারিত উক্তি রয়েছে। তিনি এ পাথরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "আমি জানি তুমি একখানি পাথর মাত্র। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে চুম্বন না করলে আমি কিছুতেই তোমাকে চুম্বন করতাম না।"

২. মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র কা'বা ঘরের আস্তানা চুম্বন করার রীতি হযরত ইবরাহীম (আ) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলেই প্রচলন করেছিলেন এবং সে জন্য এ পাথরখানাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ কালো পাথরের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যে জন্য একে চুম্বন করা যেতে পারে।–অনুবাদক

لَااِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الـدِّيْنَ وَلَـوْكَرِهَ الْـكٰفِرُوْنَ

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই, আমরা অন্য কারো বন্দেগী করি না ; আমরা কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করি—কাফেরদের কাছে এটা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"

অতপর 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়াতে হয়। এর দ্বারা হাজী একথা প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর নৈকট্য এবং তার সন্তোষ হাসিল করার উদ্দেশ্যে সবসময় এমন করে দৌড়াতে প্রস্তুত থাকবে। এ দৌড়ের সময়ও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে ঃ

اَللّٰـهُمَّ اَسْتَعْمِلْنِىْ بِسُنَّـةِ نَبِيِّـكَ وَتَـوَفَّـنِىْ عَلٰى مِـلَّـتِهٖ وَاَعِذْنِىْ مِنْ مُّضَلاَّتِ الْـفِتَنِ ـ

"হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার নবীর আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসারে কাজ করার তাওফীক দাও। তোমার নবীর পথেই যেন আমার মৃত্যু হয় এবং সত্য পথভ্রষ্টকারী ফেতনা থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

কখনো কখনো এই দোয়া পড়া হয় ঃ

رَبِّ اغْـفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَـمَّـا تَعْلَمُ اِنَّـكَ اَنْتَ الْاَعَـزُّ الْاَكْرَمُ ـ

"হে রব! ক্ষমা কর, দয়া কর, আমার যেসব অপরাধ সম্পর্কে তুমি অবহিত তা মাফ করে দাও। তোমার শক্তি সবচেয়ে বেশী, দয়াও অতুলনীয়।"

এরপর হাজী যেন আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়। তাই পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত তাকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে হয়। একদিন 'মিনা'র ছাউনীতে অতিবাহিত করতে হয়, পরের দিন আরাফাতে অবস্থান করতে হয় এবং সেনাপতির 'খুতবার' নির্দেশ শুনতে হয়। রাতে মুজদালিফায় গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। দিন শেষে আবার 'মিনায়' ফিরে যেতে হয় এবং এখানে পাথর টুকরা নিক্ষেপ করে 'চাঁদমারী' করতে হয়। আবরাহা বাদশার সৈন্য-সামন্ত কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে আল্লাহর সিপাহী বলে ওঠে ঃ اَللّٰـهُ اَكْبَرُ رَغْمًـا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهٖ –"আল্লাহ মহান। শয়তান ও তাঁর অনুসারীদের মুখ ধূলায় মলিন হোক।" এবং اَللّٰـهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ –"হে আল্লাহ ! তোমার গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণার ও তোমার নবীর আদেশ অনুসরণের তাওফীক দাও।"

পাথর টুকরা দিয়ে চাঁদমারী করার অর্থ একথা প্রকাশ করা যে, হে আল্লাহ! তোমার দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কিংবা তোমার আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্য যে-ই চেষ্টা করবে, আমি তোমার বাণীকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে এমনি করে লড়াই করবো। তারপর এ স্থানেই কুরবানী করা হয়। এটা দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছা ও বাসনার বাস্তব এবং সক্রিয় প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এরপর সেখান থেকে কা'বার দিকে যাত্রা করা হয়—যেন ইসলামের মুজাহিদগণ কর্তব্য সমাধা করে বিজয়ীর বেশে 'হেড কোয়ার্টারের' দিকে ফিরে যাচ্ছে। তাওয়াফ এবং দু' রাকাআত নামায পড়ার পর এহরাম খোলা হয়। এহরাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ হারাম হয়েছিল এখন তা হালাল হয়ে যায়, হাজীর জীবন এখন স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। এ জীবন শুরু হওয়ার পর আবার তাকে 'মিনায়' গিয়ে ক্যাম্প গাড়তে হয় এবং পরের দিন পাথরের সেই তিনটি স্তম্ভের ওপর আবার কংকর দ্বারা চাঁদমারী করতে হয়। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'জুমরাত'। এটা আবরাহা বাদশার মক্কা আক্রমণকারী ফৌজের পশ্চাদপসরণ ও তাকে পরাভূত করার প্রতীক মাত্র। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের বছর হজ্জের সময়ই আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে আবরাহা এসেছিল। আল্লাহর তরফ থেকে আসমানী পাখী কংকর নিক্ষেপ করেই তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। তৃতীয় দিবসে পুনরায় সেই স্তম্ভগুলোর ওপর পাথর নিক্ষেপ করার পর হাজী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে এবং সাতবার তার দ্বীনের কেন্দ্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে। এ তাওয়াফকে বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। এটা সম্পন্ন হলেই হজ্জের কাজ সমাপ্ত হয়।[১]

হজ্জের নিয়ত এবং সে জন্য প্রস্তুতি ও যোগাড় যন্ত্র থেকে শুরু করে পুনরায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত কমবেশী তিন মাস কাল ধরে হাজীর মন-মগযে কত বিরাট ও গভীর খোদায়ী ভাবধারা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে ওপরের এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা অনুমান করা খুবই সহজ। এ কাজে শুরু থেকেই সময়ের কুরবানী করতে হয়, অর্থের কুরবানী করতে হয়, সুখ-শান্তি ত্যাগ করতে হয়, অসংখ্য পার্থিব সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হয়। হাজীর নিজের

১. সাধারণত মনে করা হয় যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামেরকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার সময় শয়তানের প্রতারণা দেখে তিনি তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মুক্তিপণ হিসেবে যে দুম্বা কুরবানীর জন্য পাঠান হয়েছিল তা ছুটে পালাচ্ছিলো দেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, তারই স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ হজ্জ পালনের সময় পাথর নিক্ষেপ একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু জুমরাতের কারণ যে এটাই, এরূপ কথা কোন সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়নি।

মনের অনেক ইচ্ছা-বাসনা স্বাদ-আস্বাদনকে উৎসর্গ করতে হয়। আর এ সবকিছুই তাকে করতে হয় কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য—নিজস্ব কোনো স্বার্থ তাতে স্থান পেতে পারে না। তারপর এ সফরে তাকওয়া-পরহেযগারীর সাথে সাথে আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর দিকে মনের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায়, তাও মানুষের মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, বহুদিন পর্যন্ত সেই প্রভাব স্থায়ী হয়ে থাকে। 'হারাম শরীফে' কদম রেখে হাজী প্রত্যেক পদে পদে সেসব মহামানবদের অতীত কর্মধারার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পায়। যাঁরা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করে এবং আল্লাহর দীন ইসলামকে কায়েম করতে গিয়ে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করেছেন, যারা সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, নানা প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করেছেন, নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছেন, অসংখ্য যুলুম বরদাশত করেছেন, কিন্তু আল্লাহর দীনকে কায়েম না করা পর্যন্ত তাঁরা এতটুকু ক্লান্তিবোধ করেননি। যেসব 'বাতিল' শক্তি মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করতে বাধ্য করছিল, তাঁরা তাদের সকলেরই মস্তক চূর্ণ করে দীন ইসলামের পতাকা উন্নত করে ধরেছেন।

এসব সুস্পষ্ট নিশানা ও বরকত মণ্ডিত নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছা-বাসনা, সাহস ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে প্রাণস্পর্শী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, তা অন্য কোনো জিনিস থেকে গ্রহণ করতে পারে না। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করায় দীন ইসলামের কেন্দ্র বিন্দুর সাথে হাজীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হজ্জ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা হাজীর জীবনকে সৈনিকের ট্রেনিং দিয়ে গঠন করা হয়। নামায, রোযা এবং যাকাতের সাথে এসবকে মিলিয়ে যাচাই করলে পরিষ্কার মনে হবে যে, ইসলাম এসব কিছুর সাহায্যে কোনো এক বিরাট উদ্দেশ্যে মানুষকে ট্রেনিং দান করে। এর জন্যই মক্কা পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রতি বছরই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক মুসলমান ইসলামের এ প্রাণ কেন্দ্রে আসবে এবং ট্রেনিং লাভ করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের দিকে ফিরে যাবে।

অতপর আরো একটি দিক লক্ষ্য না করলে হজ্জের কল্যাণ ও স্বার্থকতা পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা যাবে না। এক একজন মুসলমান কখনো একাকী হজ্জ করে না। দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানের জন্যই হজ্জ করার একটি তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান একত্রিত হয়ে একই সময়ে হজ্জ করে। ওপরের কথা দ্বারা আপনি শুধু এতটুকু বুঝতে পারেন যে, আলাদাভাবে একজন মুসলমান হজ্জ করলে তার ওপর তার কতখানি প্রভাব পড়া সম্ভব। পরবর্তী প্রবন্ধের মারফতে আপনি বিস্তারিতরূপে জানতে পারবেন

যে, দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য হজ্জের একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে হজ্জের কল্যাণ কত লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। একটি কাজে দু'টি ফল নয়, কয়েক হাজার ফল লাভের সুযোগ করে দেয়া একমাত্র ইসলামেরই এক অতুলনীয় কীর্তি। নামায আলাদাভাবে পড়ারও ফায়দা কম নয়। কিন্তু তার সাথে জামায়াতে শামিল হয়ে ইমামের পিছনে নামায পড়ার শর্ত করে দিয়ে এবং জুময়া ও দু' ঈদের নামায জামায়াতের সাথে পড়ার নিয়ম করে তার ফায়দা অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখায় রোযাদারদের মন ও চরিত্র গঠন কাজ কম সাধিত হতো না। কিন্তু সকল মুসলমানের জন্য একটি মাসকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে তার ফায়দা এত পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে, যা গুণে শেষ করা যায় না। এক একজন লোকের ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করার উপকারিতাও কম নয় ; কিন্তু বায়তুলমালের মারফত যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার উপকারিতা এতদূর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে এর ধারণাও করা যায় না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনেই সকল মুসলমানের যাকাত 'বায়তুলমালে' জমা করা হয় এবং সুসংবদ্ধভাবে প্রাপকের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তাতে সমাজের অভাবগ্রস্ত লোকদের অপূর্ব কল্যাণ সাধিত হয়। হজ্জের ব্যাপারেও তাই। একাকী হজ্জ করলেও হাজার হাজার মানুষের জীবনে বিরাট বিপ্লব সূচিত হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার মুসলমানকে একত্রিত হয়ে হজ্জ করার রীতি করে দিয়ে সীমাহীন কল্যাণ লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

# হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন

যেসব মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরয হয় অর্থাৎ যারা কা'বা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে এমন লোক দু' একজন নয়। প্রত্যেক এলাকায় তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। বলতে গেলে প্রত্যেক শহরে কয়েক হাজার এবং প্রত্যেক দেশে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বছরই এদের অধিকাংশ লোকই হজ্জ করার ইচ্ছা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। দুনিয়ার যেসব জায়গায় মুসলমান বসবাস করে, তথায় হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী যিন্দেগীর এক নতুন চেতনা কিরূপ জেগে ওঠে, তা সত্যই লক্ষ্য করার মত। প্রায় রমযান থেকে শুরু করে যিলকদ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত লোক হজ্জ যাত্রায় আয়োজন করে রওয়ানা হয়। আর ওদিকে মহররম মাসের শেষ দিক থেকে সফর, রবিউল আউয়াল তথা রবিউস্‌সানী পর্যন্ত হাজীদের প্রত্যাবর্তনের ধারা চলতে থাকে। এ ছয় মাসকাল পর্যন্ত সকল মুসলিম লোকালয় এক প্রকার ধর্মীয় ভাবধারায় সরগরম হয়ে থাকে। যারা হজ্জে গমন করে আর হজ্জ করে ফিরে আসে, তারা তো ধর্মীয় ভাবধারায় নিমগ্নই হয়ে থাকে ; কিন্তু যারা হজ্জে গমন করে না, হাজীদের রওনা করাতে, এক একটি ষ্টেশন থেকে তাদের চলে যাওয়া আবার ফিরে আসার সময় তাদের অভ্যর্থনা করায় এবং তাদের কাছে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনার ব্যাপারে তারাও কিছুটা হজ্জে গমনের আনন্দ লাভ করে থাকে।

এক একজন হাজী যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তাওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে ওঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের কাছে বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কারবারের চূড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এতে মনে হয় যে, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় দিল পবিত্র হয়ে গেছে। এভাবে এক একজন হাজীর এ পরিবর্তনে তার চারপাশের লোকদের ওপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এরূপ প্রত্যেক বছরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গড়ে এক লক্ষ লোকও এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে তাদের এ গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের ওপর না পড়ে পারে না। তারপর হাজীদের কাফেলা যে স্থান অতিক্রম করে, তাদেরকে দেখে তাদের সাথে সাক্ষাত করে 'লাব্বাইকা' আওয়ায শুনে সেখানকার কত মানুষের দিল অলৌকিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কত

মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে ওঠে। এসব লোক যখন আবার নিজ নিজ দেশের দিকে—দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে হজ্জের প্রাণস্পর্শী ভাবধারা বিস্তার করে প্রত্যাবর্তন করে এবং দলে দলে মানুষ তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরের আলোচনা শুনে কত অসংখ্য মানুষের মনে এবং অসংখ্য পরিমণ্ডলে ইসলামী ভাবধারা জেগে ওঠে।

এ জন্যই আমি বলতে চাই যে, রযমান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম তেমনি হজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের মৌসুম। মহান বিজ্ঞ আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা এ জন্য করেছিলেন যেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কা'বাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বন্ধ হয়ে না যায় ততদিন যেমন মানুষের মৃত্যু হয় না সেরূপ হজ্জের এ সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনও চলতে থাকবে।

একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেই আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, পৃথিবীর দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলে একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। এহরামের এ 'ইউনিফরম' ধারণ করার পর পরিষ্কার মনে হয় যে, দুনিয়ার হাজার হাজার জাতির মধ্য থেকে এই যে লক্ষ লক্ষ ফৌজ আসছে, এরা বিশ্বের বাদশাহ ও যমীন-আসমানের রাজাধিরাজ এক আল্লাহ তাআলারই ফৌজ। এরা দুনিয়ার হাজার হাজার জাতি ও কাওম থেকে ভর্তি হয়েছে। এরা সকলে একই বাদশাহর ফৌজ। এদের সকলের ওপর একই সম্রাটের আনুগত্য ও গোলামীর চিহ্ন লেগে আছে, একই বাদশার আনুগত্যের সূত্রে এরা সকলেই পরস্পর বিজড়িত রয়েছে এবং একই রাজধানীর দিকে, মহাসম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার জন্য ছুটে চলেছে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এ সিপাহী 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সামনে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ থেকে এ একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন—কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যত নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয় এবং সকলেই একত্রিত হয়ে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে, সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, রুকূ'-সিজদা করে, সকলে একই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে এবং শুনে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তারপর এ বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই উৎরাইয়ে যখন এ আওয়ায উত্থিত হয়, যখন নামাযের সময়ে এবং প্রভাতে এ শব্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যখন কাফেলাসমূহ পরস্পর মিলিত হবার সময় এ শব্দই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখন চারদিকে এক আশ্চর্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে পরিবেশে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, এক অচিন্তনীয় ভাবধারায় সে মত্ত হয়ে পড়ে, 'লাব্বাইকা' ধ্বনির আকর্ষণে সে এক ভাবজগতে ছুটে যায়। অতপর কা'বায় পৌঁছে দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সমাগত জনসমুদ্রের একই পোশাকে নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা, সকলের একই সাথে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো, সকলের মিনায় উপস্থিত হয়ে তাবু জীবনযাপন করা এবং তথায় এক ইমামের কণ্ঠে ভাষণ (খোতবা) শ্রবণ করা, তারপর মুযদালিফায় তাবুর নীচে রাত্রি যাপন করা, আবার মিনার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করা, সকলে মিলে আকাবায় পাথর দ্বারা চাঁদমারী করা, তারপর সকলের কুরবানী করা, সকলের একই সাথে কা'বায় ফিরে এসে তার তাওয়াফ করা, সকলের একই কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে নামায পড়া—এসব কাজে যে পবিত্র পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় তার তুলনা নেই।

তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে আগত অসংখ্য মানুষের একই কেন্দ্রে সম্মিলিত হওয়া এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ঐক্যভাবের সাথে একত্রিত হওয়া এমন পবিত্র উদ্দেশ্য ও ভাবধারা এবং নির্মল কাজ-কর্ম সহকারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের জন্য এটা এক বড় নিয়ামত। এ নিয়ামত ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মই দিতে পারেনি। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলত হওয়া কোনো নতুন কথা নয় চিরকালই এরূপ হয়েছে। কিন্তু তাদের এ সম্মেলন হয় যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের গলা কাটার জন্যে। অথবা সন্ধি সম্মেলনে বিজিত দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা

করে নেবার জন্যে কিংবা বিশ্বজাতি সম্মেলনে এক একটি জাতির বিরুদ্ধে ধোঁকা ও প্রতারণার ষড়যন্ত্র, যুলুম এবং বেঈমানীর জাল ছড়াবার জন্য ; অথবা পরের ক্ষতি সাধন করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার মতলবে। সমগ্র জাতির জনসাধারণের নির্মল মন, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে এবং প্রেম ভালোবাসা, নিষ্ঠা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব সহকারে একত্রিত হওয়া। চিন্তা, কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে মিলিত হওয়া—তাও আবার একবার মিলিত হয়েই ক্ষান্ত না হওয়া বরং চিরকালের জন্য প্রত্যেক বছর একই কেন্দ্রে একত্রিত হওয়া বিশ্বমানবতার প্রতি এতবড় নিয়ামত দুনিয়ায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্ম ব্যবস্থাই দিতে পেরেছে কি ? বিশ্ব শান্তি স্থাপনে জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে দেয়া এবং লড়াই ঝগড়ার পরিবর্তে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কেউ পেশ করতে পেরেছে কি ? ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি ; সে আরো অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বছরের চারটি মাস হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম কা'বা যাতায়াতের এ চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হজ্জ ও ওমরার কারণে একটি বছরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত থেকে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে একটি হেরেম দান করেছে। এ হেরেম কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে মানুষ মারা তো দূরের কথা, কোনো জন্তুও শিকার করা যেতে পারে না। এমনকি এখানকার ঘাসও কেটে ফেলার অনুমতি নেই। এখানকার কোনো কাঁটাও চূর্ণ করা যায় না, কারো কোনো জিনিস এখানে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। ইসলাম পৃথিবীর বুকে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শহরে কারো কোনো হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহিতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে আল্লাহ পাক এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ –আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।"

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারিত করেছে। এ কেন্দ্রের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ الحج : ٢٥ –"যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এ কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে।" আমেরিকার বাসিন্দা হোক কি আফ্রিকার, চীনের বাসিন্দা হোক কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, সে যদি মুসলমান হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। সমগ্র হারাম শরীফের এলাকা মসজিদের ন্যায়। মসজিদে গিয়ে যে মুসলমান নিজের জন্য কোনো স্থান করে নেয়, সে স্থান তারই হয়ে যায় ; কেউ তাকে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারে না, কেউ তার কাছে ভাড়া চাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি সারা জীবনও সেই স্থানে বসে থাকে, তবুও সেই স্থানকে নিজের মালিকানা স্বত্ব বলে দাবী করতে এবং তা বিক্রি করতে পারে না। এর জন্য সে ভাড়াও চাইতে পারে না। এভাবে সেই ব্যক্তি যখন সেই স্থান থেকে চলে যাবে তখন অন্য কেউ এসে সেখানে আসন করে নিতে পারে, যেমন পূর্বের লোকটি পেরেছিল। 'হারাম শরীফের' অবস্থাও ঠিক এরূপ।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ مَكَّةُ مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ "মক্কা নগরের যে স্থানে এসে যে ব্যক্তি প্রথমে অবতরণ করবে সেই স্থান তারই হবে।" এখানকার বাড়ী-ঘরের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানকার লোকদের ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের দুয়ার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে লোকেরা তাদের প্রাঙ্গণে এসে অবস্থান করতে পারে। কোন কোনো ফকীহ এতদূরও বলেছেন যে, মক্কা নগরীর বাড়ী ঘরের কেউ মালিক নয়, তা উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে বন্টনও হতে পারে না। এসব সুযোগ-সুবিধা এবং আযাদীর মূল্যবান নিয়ামত দুনিয়ার মানুষ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পেতে পারে কি ?

এহেন হজ্জ সম্পর্কেই বলা হয়েছিল ঃ তোমরা এটা করে দেখ এতে তোমাদের জন্য কত বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সমস্ত কল্যাণকে গুণে গুণে বলার শক্তি আমার নেই। কিন্তু তবুও এ পর্যন্ত তার যে কিঞ্চিত বিবরণ ওপরে পেশ করেছি তা থেকে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

কিন্তু এসব কথা শুনার পর আমার নিজের মনের দুঃখের কথাও খানিকটা শুনুন। বংশানুক্রমিক মুসলমান হীরক খনির অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত। এ শিশু যখন জন্ম মুহূর্ত থেকেই চারদিকে কেবল হীরক দেখতে পায় এবং হীরক খণ্ড নিয়ে খেলা করতে থাকে, তখন তার দৃষ্টিতে হীরকের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদও সাধারণ পাথরের মতই মূল্যহীন হয়ে যায়। বংশীয় মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক এরূপ। সমগ্র জগত যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং যা থেকে

বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা নানা প্রকার দুঃখ-মুসিবতে নিমজ্জিত রয়েছে, আর বিশ্ব মানব যার সন্ধান করতে ব্যাকুল রয়েছে, সেই মূল্যবান নিয়ামতসমূহ বর্তমান মুসলমানরা বিনামূল্যে লাভ করেছে, এজন্য তালাশ-অনুসন্ধান এবং খোঁজাখুঁজির জন্য একবিন্দু পরিশ্রমও তাদের করতে হয়নি। এসব ছাড়াই তারা এটা পেয়েছে শুধু এ জন্য যে, সৌভাগ্যবশত তারা মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেছে। যে কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমগ্র জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিতে পারে, শিশুকাল থেকেই তা তাদের কানে প্রবেশ করছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং লোকদের পরস্পরের ভাই ও দরদী বন্ধুতে পরিণত করার জন্য নামায-রোযা স্পর্শমণি অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। এরা জন্মলাভ করেই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে এটা লাভ করেছে। যাকাত ইসলামী সমাজের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা, এদ্বারা শুধু মনের 'নাপাকীই' দূর হয় না, দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাও সুষ্ঠুতা লাভ করে—যা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার মানুষ একে অপরের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু মুসলমানরা তা বিনাব্যয়ে এবং বিনা শ্রমে লাভ করেছে। এটা ঠিক তেমনিভাবে, যেমন খুব বড় চিকিৎসকের সন্তান ঘরে বসেই বড় বড় রোগের তালিকা বিনামূল্যে লাভ করে থাকে। অথচ এর জন্য অন্যান্য মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সন্ধান করে বেড়ায়। হজ্জও একটি বিরাট ব্যবস্থা, সমগ্র দুনিয়ায় এর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামী আন্দোলনের আওয়ায পৌঁছাবার জন্য এবং আন্দোলনকে চিরকালের তরে জীবিত রাখার জন্য এটা অপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লায় বিশ্বাসী, সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেবার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোনো পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। যুগ-যুগান্তর থেকে জীবন্ত ও প্রচলিত এ ব্যবস্থাও মুসলমানগণ নিজেদের সম্পদ হিসেবে লাভ করেছে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা শ্রমে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, মুসলমান বিনাশ্রমে প্রাপ্ত এ মূল্যবান সম্পদের কোনো কদর বুঝেনি, বরং তারা এটা নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে খেলা করছে, যেমন হীরকখণ্ড নিয়ে খেলা করে হীরক খনিতে প্রসূত শিশু সন্তান। আর তাকে সে মনে করে সাধারণ পাথরের ন্যায় মূল্যহীন। মুসলমান নিজেদের মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে এ বিরাট মূল্যবান সম্পদ ও শক্তির উৎস নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে খেলা করছে। এর অপচয় করছে—এটাকে নষ্ট করছে—এসব দেখে আমার প্রাণ জ্বলে যায়। পাথর চূর্ণকারীর হাতে মূল্যবান হীরক খণ্ড বরবাদ

হতে দেখে সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। কোনো এক কবি সত্যিই বলেছিলেন ঃ

"যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কা ভূমি
হেথাও থাকবে গাধা জেনে রাখ তুমি।"

অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায় মহান পয়গাম্বরের গাধা হলেও পবিত্র মক্কার দর্শন দ্বারা তার কোনো উপকার হতে পারে না। সে যদি সেখানে থেকেও যায় তথাপি সে যেমন গাধা তেমন গাধাই থেকে যাবে।

নামায-রোযা হোক, কিংবা হজ্জ হোক, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রশিক্ষণ। কিন্তু যারা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না, এর উপকার ও কল্যাণ লাভ করার কথা এতটুকুও ভাবে না ; বরং যারা এ ইবাদাতসমূহের যে কোনো মকছুদ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তৎসম্পর্কেও বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা রাখে না। তারা যদি পূর্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি শুধু ওগুলোর নকলই করতে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা সেই সুফল কখনো আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণত আজকের মুসলমানগণ এভাবেই ঐ ইবাদাতগুলো করে চলেছে। সকল ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ তারা ঠিকই বজায় রাখছে ; কিন্তু (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) এতে কোনো প্রাণশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন কাম্য ছিল, তা যেমন দেখা যায় না তেমন হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও তার মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সকল এলাকা অতিক্রম করে হজ্জে গমন করা হয়, সেখানকার মুসলমান-অমুসলমান অধিবাসীদের ওপরেও তার কোন উত্তম চরিত্রের প্রভাব পতিত হয় না। বরং অনেকের অসৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অশালীন ব্যবহার ও চারিত্রিক দুর্বলতা ইসলামের সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়। বস্তুত এসব কারণেই আমাদের অনেক মুসলিম যুবকও প্রশ্ন করেন যে, 'হজ্জের উপকার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।' অথচ হজ্জ তো ছিল এমন এক জিনিস যে তাকে প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করা হলে কাফেররাও এর উপকার প্রকাশ্যে দেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি কোনো আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ সদস্য প্রতি বছর বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে এক স্থানে সমবেত হয় এবং আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় বিভিন্ন দেশ ও নগর হয়ে যাওয়ার সময়ে নিজেদের পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তাধারা ও পবিত্র নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়, যেখানে যেখানে অবস্থান করে কিংবা যে যে স্থান অতিক্রম করে সেখানে

নিজেদের আন্দোলনের যাবতীয় মৌলিক নীতির শুধু মৌখিক আলোচনা না করে আপন আচরণ ও কর্মতৎপরতায়ও তাকে বাস্তবায়িত করতে থাকে, আর এটা শুধু দশ-বিশ বছরই নয় বরং বছরের পর বছর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেই চলতে থাকে তাহলে বলুন তো, এটা কোনো নিষ্ক্রিয় জিনিস থেকে হতে পারে কি ? প্রকৃতপক্ষে হজ্জ এরূপ হলে তার উপকার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজনই হতো না। তখন অন্ধ ব্যক্তিও এর উপকার দেখতে পেত। বধির ব্যক্তিও এর কল্যাণ শুনতে পারতো। প্রতি বছরের হজ্জ কোটি কোটি মুসলমানকে নেক বান্দায় পরিণত করতো, হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করতো, লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল করে দিত। কিন্তু আফসোস ! আমাদের মূর্খতার কারণে কত বড় মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

হজ্জের অন্তর্নিহিত এ বিরাট সার্থকতা ও উপকারিতা পুরোপুরি লাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্রস্থলে কোনো বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব বর্তমান থাকা উচিত। যা এ মহান বিশ্ব শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে এমন একটি হৃৎপিণ্ড (দিল) থাকা উচিত ছিল যা প্রত্যেক বছর সমগ্র বিশ্ব দেহে তাজা রক্তের দ্বারা প্রবাহিত করতে সক্ষম। এমন একটি মস্তিষ্ক থাকারও দরকার ছিল যা এ হাজার হাজার আল্লাহর দূতের মারফতে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম পৌঁছাতে চেষ্টা করতো। আর কিছু না হোক, অন্তত এ কেন্দ্রভূমিতে খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবরূপ যদি বর্তমান থাকতো, তবুও দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যেক বছরই সেখান থেকে খালেস ইসলামী জিন্দেগী এবং দীনদারীর শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখানে তেমন কিছু নেই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরব দেশে মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে ওসমানী যুগ পর্যন্ত সকল অক্ষম ও অনুপযুক্ত শাসক ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অধিবাসীগণকে উন্নতি লাভের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ফলে আরব দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—সকল দিক দিয়েই অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এ কারণে যে ভূখণ্ড থেকে একদা ইসলামের বিশ্বপ্লাবী আলোক ধারা উৎসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ তাই ইসলামের পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধ কূপে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে ইসলামের জ্ঞান নেই, ইসলামী জীবনধারা নেই। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বুকভরা আশা ও ভক্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর পাক

'হারামে' আগমন করে ; কিন্তু এ এলাকায় পৌঁছে তার চারদিকে যখন কেবল মূর্খতা, মলিনতা, লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, আত্মপূজা, চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃংখলতা এবং জনগণের নির্মম অধঃপতিত অবস্থা দেখতে পায়, তখন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অনেক লোক হজ্জ করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে অধিকতর দুর্বলই করে আসে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পরে জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে যে পৌরোহিত্যবাদ ও ঠাকুর পূজার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং যা শেষ নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্মূল করেছিলেন, আজ তা-ই প্রবলরূপে পুনঃপ্রবির্তত হয়েছে। 'হারামে কা'বার' ব্যবস্থাপক পূর্বের ন্যায় আবার সেবায়েত হয়ে বসেছে। আল্লাহর ঘর তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ঘরের প্রতি যারা ভক্তি রাখে তারা এদের শিকার বিশেষ। বিভিন্ন দেশে বড় বড় বেতনভুক্ত এজেন্ট নিযুক্ত রয়েছে, তারা ভক্তদেরকে চারদিক থেকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। কুরআনের আয়াত আর হাদীসের নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে তাদেরকে হজ্জ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে এজন্য নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। বরং এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আদেশ শুনলে তারা অবশ্যই হজ্জ করতে যাবে এবং তাতে তাদের যথেষ্ট আমদানী হবে। এসব দেখে পরিষ্কার মনে হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বুঝি এ বিরাট ব্যবস্থা করেছেন শুধু এ পুরোহিত 'পাণ্ডা' এবং দালালদের প্রতিপালনের জন্য। তারপর হজ্জ যাত্রায় বাধ্য হয়ে মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সফরের শুরু থেকে হজ্জ করে বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় ধর্মীয় মজুর এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা জোকের ন্যায় তাদের সামনে উপস্থিত হয়। মুয়াল্লেম, তাওয়াফ শিক্ষাদাতা, কা'বার কুঞ্জিকা বাহক এবং স্বয়ং হেজায সরকার—সকলেই এ ধর্ম ব্যবসায়ে সমানভাবে অংশীদার। হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই পয়সা দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এমন কি পবিত্র কা'বা গৃহের দরযাও পয়সা ব্যতীরেকে কোনো মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। ইসলামের এ তথাকথিত খাদেমগণ এবং কেন্দ্রীয় উপাসনাগারের সেবায়েতগণও শেষ পর্যন্ত বেনারস ও হরিদ্বারের পণ্ডিত পুরোহিতদের পেশা অবলম্বন করে নিয়েছে, অথচ এটাই একদা এ পুরোহিতবাদের মূলোচ্ছেদ করেছিল। যেখানে ইবাদাত করানোর কাজ বিশেষ ব্যবসায় এবং ইবাদাতের স্থান উপার্জনের উপায়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আল্লাহর আয়াত কেবল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে, লোক তা শুনে হজ্জ করতে বাধ্য হবে এবং এ সুযোগে তার পকেট মেরে টাকা নিয়ে যাবে। যেখানে ইবাদাতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য

মূল্য দিতে হয় এবং দীনি কর্তব্য ব্যবসায়ের পণ্য হয়—এমতস্থানের ইবাদাতে ইসলামের প্রাণ শক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে। হাজীগণ যে এ ইবাদাতের প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভ করতে পারবে—সমস্ত কাজ যখন একটা কেনা-বেচার মাল হয়ে রয়েছে—তখন এমন আশা কিছুতেই করা যায় না।[১]

এ আলোচনা দ্বারা কারো ওপর দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই হজ্জের ন্যায় একটি বিরাট শক্তিকে কোন্ কোন্ জিনিস প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন করে দিয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মসমূহে কোনো ত্রুটি রয়েছে, এরূপ ধারণা কারোই মনে যেন না জাগে। কারণ তাতে আসলে কোনোই ত্রুটি নেই—ত্রুটি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে পূর্ণ ইসলামের অনুসরণ করে চলে না। অতএব, এ অবস্থার জন্য দায়ী বর্তমান মুসলমানরাই। তাই যে ব্যবস্থা তাদেরকে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শে পরিচালিত করতে পারতো এবং যা অনুসরণ করে তারা নেতা হতে পারতো, তা থেকে আজ কোনো ভাল ফল লাভ করা যাচ্ছে না। এমন কি অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গেছে যে, এ ব্যবস্থাই মানবতার পক্ষে সত্যই কল্যাণকর কিনা আজ সে সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক যদি কয়েকটি অব্যর্থ ওষুধের তালিকা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তার অকর্মণ্য ও নির্বোধ উত্তরাধিকারীগণের হাতে তা একেবারেই 'অকেজো' হয়ে যায়। ফলে সেই তালিকারও যেমন কোনো মূল্য হয় না, অনুরূপভাবে স্বয়ং চিকিৎসকের দুর্নাম হয়—আসল তালিকা যতই ভাল, সঠিক এবং অব্যর্থ হোক না কেন। অতএব এ নির্ভুল তালিকাকে কার্যকর করে তুলতে হলে চিকিৎসা বিদ্যায়

---

১. স্মরণীয় যে, এটা লিখিত হয়েছিল ইংরেজী ১৯৩৮ সনে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সৌদি আরব সরকার অধিকতর উন্নতির জন্য সচেষ্ট রয়েছে। আরবে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। রিয়াদ, মক্কা, জেদ্দা প্রভৃতি শহরে ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষার জন্য উচ্চ পর্যায়ে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। মদীনা তাইয়েবায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করেছে। মক্কা মোয়াজ্জমায় রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বা বিশ্ব মুসলিম সংহতি নামে মুসলিম জাহানের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র হজ্জ ও তার সম্মেলন থেকে প্রকৃত কল্যাণ ও উপকার লাভ করে মুসলমানগণ যাতে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম উম্মাতের মধ্যে দীনি প্রাণ শক্তি প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে, তার জন্য এ প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট রয়েছে। এ সকল দিক থেকে বর্তমানে অবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক। এখন দু'টি কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অপরিহার্য। প্রথমটি হচ্ছে, 'হারামাইনিস-শারীফাইন' (অর্থাৎ পবিত্র মক্কা ও মদীনা)-কে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বনাশা সয়লাব থেকে রক্ষা করতে হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুয়াল্লেমদের কর্মপদ্ধতির সংশোধন করতে হবে। আল্লাহ সহায় হোন, সৌদি সরকার এ পর্যায়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

পারদর্শিতা অপরিহার্য। অপটু ও অজ্ঞ লোকরা সেই তালিকা অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করলে তা দ্বারা যেমন কোনো উপকার পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। ফলে জাহেল লোকেরা যারা তালিকার যথার্থতা যাচাই করতে নিজেরা অক্ষম—তারাই শেষ পর্যন্ত মনে করতে শুরু করবে যে, মূলত তালিকাটাই ভুল। বর্তমান মুসলমানদের সর্বাত্মক অধঃপতনের ব্যাপারে ইসলামেরও ঠিক এ অবস্থা হয়েছে।

*সমাপ্ত*